চতুর্বর্গ পুরুষার্থ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ
(Purusārthas and their inter-relation)

৩.১. চতুর্বর্গ পুরুষার্থ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ (Purusārthas and their inter-relation)

কাম্যবস্তু মনে করে মানুষ যাকে কামনা করে সেটাই মানুষের জীবনে পুরুষার্থ। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষের প্রয়োজনসাধক চারটি কাম্যবস্তুর অর্থাৎ পুরুষার্থের—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের—উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের জীবনে ক্রম অনুসারে, এই চারটি পুরুষার্থের বিন্যাস যদিও (১) অর্থ, (২) কাম, (৩) ধর্ম এবং (৪) মোক্ষ, এখানে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে 'ধর্ম'কেই পুরুষার্থরূপে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এর হেতু হল, ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্মকে বা সৎকর্মকে পরিত্যাগ করে জীবনের কোন অভীষ্টই লাভ করা যায় না। যেমন— 'অর্থ'কে ধর্মপথে বা সৎপথে উপার্জন ও ব্যয় করতে হয়; 'কাম'কেও ধর্মসম্মত সংযতভাবে উপভোগ করতে হয়; অন্যথায় পরম অভীষ্ট 'মোক্ষ' লাভ সম্ভব হয় না। এজন্যই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের আলোচনায় ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে 'ধর্ম'কে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও মানুষের জীবনে তাদের ক্রম বা বিন্যাসটি হল— অর্থ-কাম-ধর্ম-মোক্ষ। আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে এই বিন্যাসটি অনুসরণ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল :

(১) অর্থ
(২) কাম
(৩) ধর্ম এবং
(৪) মোক্ষ।

(১) অর্থ : 'অর্থ'কে পুরুষার্থের অন্তর্ভুক্তি এটাই নির্দেশ করে যে, ভারতীয় নীতিশাস্ত্র জীবন-বিমুখ বা বাস্তব-বিমুখ নয়। জীবনকে যাপনযোগ্য করার জন্য অর্থের যে প্রয়োজন আছে, একথা ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে অস্বীকার করা হয়নি। 'অর্থ'কে পুরুষার্থরূপে গণ্য করে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে একথাই বলা হয়েছে যে, ব্যক্তির প্রয়োজনে, পারিবারিক দায়িত্ব পালনে, সামাজিক কর্তব্য সাধনের জন্য এবং ধর্ম পালনের জন্য অর্থ মানুষের কাম্যবস্তু। তবে, অর্থের জন্যই অর্থকে কামনা করা হয় না, অর্থাৎ অর্থ স্বতঃমূল্যবান পদার্থ নয়। অর্থ পরতঃমূল্যবান। অর্থকে কামনা করা হয় অপর দুটি পুরুষার্থের জন্য—কাম সাধনের জন্য এবং ধর্ম পালনের জন্য। বিবাহিত জীবন-যাপনের জন্য, সংসারধর্ম পালনের জন্য, গৃহীর অর্থের প্রয়োজন হয়।

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

তেমনি আবার, বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠানের জন্য, শাস্ত্রসম্মতভাবে আশ্রমধর্ম পালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। কাজেই, অর্থ মানুষের কাম্যবস্তু।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্র জীবনবিমুখ নয়, জীবনমুখী ; বাস্তববিমুখ নয়, বাস্তবমুখী। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষকে অর্থ উপার্জনে সক্ষম করার জন্য আশ্রমধর্মের অন্তর্গত **ব্রহ্মচর্য আশ্রমের** উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুগৃহে বসবাস করে শিষ্যকে জীবনের প্রথম ২৫টি বছর অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হয়। জীবনের এই অধ্যায়টি (ব্রহ্মচর্য আশ্রম) প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী গৃহস্থ আশ্রমের জন্য এক প্রস্তুতিপর্ব। গার্হস্থ্যজীবন সুপরিচালনার জন্য অর্থ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। সমাজে মানমর্যাদা-লাভ ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্যও অর্থ প্রয়োজনীয়।

সমাজ বিত্তবান (অর্থবান) ব্যক্তিকে—উচ্চকুলজাত, জ্ঞানী, বিদ্বান, ধার্মিক, বাগ্মী, সুদর্শন ইত্যাদিরূপে গণ্য করে, অর্থাৎ অর্থের সঙ্গে মানবিক সব ধর্মকেই যুক্ত করে।

অর্থ না থাকলে পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা যায় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটলে শরীর দুর্বল হয় এবং শরীর দুর্বল হলে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। কাজেই, অর্থের অভাবে ধর্মীয় এবং নৈতিক কর্তব্য-সাধনও সম্ভব হতে পারে না। কুমারসম্ভব কাব্যগ্রন্থে কবি কালিদাসও তাই বলেছেন, 'শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্' অর্থাৎ নৈতিক কর্তব্যকর্মের ভিত্তিভূমি হল মানুষের শরীর। শরীরকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান করতে হলে অর্থ প্রয়োজনীয়।

তবে, অর্থ কাম্যবস্তু হলেও সৎ উপায়ে তা উপার্জন করতে হবে এবং সৎপথে সেই অর্থকে ব্যয় করতে হবে। অসৎপথে অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় ভারতীয় নীতিশাস্ত্র-বিরোধী এবং তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অর্থ যদি অপরকে বঞ্চনা ক'রে অথবা প্রতারিত ক'রে অথবা চুরি ক'রে উপার্জিত হয় এবং কেবল নিজের সুখ সম্ভোগে ও কাম-সাধনে ব্যয়িত হয়, তাহলে সেই অর্থকে 'পুরুষার্থরূপে' গণ্য করা যাবে না। ন্যায়সম্মত পথে, সৎপথে অর্থ উপার্জন করে তা যদি নিজের এবং অপরাপর বহুজনের, পশুপক্ষী ও বৃক্ষ-লতার হিত সাধনে নিয়োজিত হয় তবেই সেই অর্থকে 'কাম্যবস্তু' বা 'পুরুষার্থ' বলা যাবে। সহজ কথায়, **ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুসারে, 'পরম পুরুষার্থ মোক্ষ' লাভের যা সহায়ক নয় তা কখনই মানবজীবনের পুরুষার্থরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না।**

(২) **কাম ঃ** ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ভোগবাদের পরিবর্তে ত্যাগবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চতুর্বর্গ পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠপুরুষার্থ হল মোক্ষ। জৈবিক কামনা-বাসনা ও ভোগলিপ্সা পরিত্যাগ করতে না পারলে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। কিন্তু **বাস্তবমুখী ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে, মানুষের জীবনে, দৈহিক সুখসম্ভোগকেও প্রয়োজনীয় বলা হয়েছে এবং কামের পরিচর্যার জন্য, দাম্পত্যরতির জন্য, গৃহস্থ-আশ্রমের উল্লেখ করা হয়েছে।** ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করা হয়নি। মনস্তত্ত্ব অনুসারে, পশুর মতো মানুষের জীবনেও অন্ধ সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ আছে এবং পশুর মতো মানুষও ঐসব প্রবৃত্তিকে কোন না কোনভাবে পরিতৃপ্ত করতে চায়। **যৌন-প্রবৃত্তি সহজাত প্রবৃত্তির অন্যতম, যাকে তৃপ্ত না করলে মানুষের জীবনে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।** এজন্যই গৃহস্থ-জীবনে বিবাহের মাধ্যমে মানুষের যৌনসুখসম্ভোগের বিধান দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রীয় এই বিধান অমান্য করলে অর্থাৎ গৃহস্থজীবনে বিবাহ-বন্ধনে

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

আবদ্ধ হয়ে কামের পরিচর্যা না করলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বাভাবিক হতে পারে না এবং সমাজও নানাভাবে ব্যভিচারগ্রস্ত হয়। শাস্ত্রকার মনু-ঋষি তাই বলেন 'অবিবাহিত মানুষ সম্পূর্ণ নয়, অসম্পূর্ণ—অর্ধ-মানুষ।'

তাছাড়া, **সন্তান উৎপাদনের জন্য, বংশ রক্ষার জন্য, সর্বোপরি মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও কাম প্রয়োজনীয়।** 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'—এই শাস্ত্রবাক্যের নিহিতার্থ হল, 'সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ রক্ষা ও মানবজাতির রক্ষার্থে বিবাহিত জীবনে স্ত্রীসঙ্গ প্রয়োজনীয়। তবে, অমিতাচার কাম, অবৈধ কাম, অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয়। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুসারে, কেবল সংযত, সীমিত ও পরিশীলিত কামই মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সমর্থনীয়।

গৃহস্থ-জীবনে প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের প্রস্তুতির জন্য যেমন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রয়োজন, **তেমনি তৃতীয় পুরুষার্থ 'ধর্ম' পালনের জন্যও কামের প্রয়োজন।** ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুসারে ধর্ম হল কর্ম, মানুষের তথা জীবের হিতার্থে কর্ম। 'জীবে দয়া করে যেই জন/সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—এটাই হল ভারতীয় ধর্ম ও নীতির মর্মকথা। জীবের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা না থাকলে 'জীব-হিতার্থে' কর্মসাধন সম্ভব হয় না। **দাম্পত্যজীবনেই মানুষের অন্তরে প্রেম ও ভালবাসার উন্মেষ হয়।** দাম্পত্য-রতির (কামসুখ) মাধ্যমে নারী ও পুরুষ শ্রদ্ধা, স্নেহ ও প্রেম-ভালবাসার দীক্ষা নেয়। ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় বিবাহ নর এবং নারীর মধ্যে কোন সাধারণ চুক্তি নয়, নিছক আদান-প্রদানের সম্পর্ক নয়, বিবাহ হল আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য দুটি মনের মিলন। দাম্পত্য-রতিতে কেবল একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধা অথবা স্নেহ অথবা প্রেম-ভালবাসার প্রকাশ হয় না, মনের তিনটি ভাবেরই প্রকাশ ঘটে, এবং ঘটে পারস্পরিকভাবে—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, আবার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর। **উচ্চজ্ঞানে শ্রদ্ধার প্রকাশ, শরণাগতজ্ঞানে স্নেহের প্রকাশ এবং সমমানের (সহচর/সহচরী) জ্ঞানে প্রেম-ভালবাসার প্রকাশ ঘটে।** দাম্পত্য-রতিতে (কাম) স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক কখনো শ্রদ্ধামিশ্রিত, কখনো স্নেহমিশ্রিত আবার কখনো বন্ধুভাবে ভালবাসামিশ্রিত। এইপ্রকারে দাম্পত্যজীবনে প্রেম-ভালবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ ইত্যাদির উন্মেষ হওয়ার ফলেই **স্বার্থপর মানুষ ধীরে ধীরে পরার্থপর হয়** এবং সমাজের হিতসাধনকে কর্তব্যকর্মরূপে (ধর্মরূপে) গণ্য ক'রে পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হয়।

প্রথম পুরুষার্থের মতো—'অর্থের' মতো—**কামও স্বতঃমূল্যবান নয়, পরতঃমূল্যবান—মোক্ষলাভের উপায়রূপে মূল্যবান।** মোক্ষই একমাত্র স্বতঃমূল্যবান। মানুষের মধ্যে আছে নিম্নতর পশুসত্তা ও উচ্চতর দেবসত্তা। মানুষ একাধারে নরদেবতা, নরনারায়ণ। মানুষের মনুষ্যত্বের সার্বিক বিকাশের জন্য, তার আত্মোপলব্ধি বা মোক্ষলাভের জন্য, এই নিম্নতর সত্তারও লালন ও পরিচর্যা প্রয়োজন। জীবনমুখী ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে **ভোগের মাধ্যমেই ত্যাগ সম্ভব, পশুপ্রবৃত্তির পরিচর্যার মাধ্যমেই ঐ প্রবৃত্তি-সুখ 'কিঞ্চিতজ্ঞানে' পরিত্যাগ সম্ভব।** সংযত ও পরিশীলিত ইন্দ্রিয়-সুখসম্ভোগ না হলে দৈহিক সুখের (কামের) প্রতি বিতরাগ বা বৈরাগ্যের সঞ্চার হতে পারে না। এজন্যই কাম প্রয়োজনীয়। তবে, কামকে হতে হবে শাস্ত্রসম্মত। অসংযত ও অমিতাচার কাম পুরুষার্থ নয়, কেননা তা মানুষের উচ্চতর দেবসত্তাকে মসীলিপ্ত করে, কলঙ্কিত করে, জাগ্রত করে না। নীতিসম্মত ও শাস্ত্রবিহিত কামই

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে পুরুষার্থ। যা অল্প, তাতে মানুষের সুখ নেই। দাম্পত্য-রতি অল্প বা কিঞ্চিৎ। ভূমা অকিঞ্চিৎ। ভূমাই পরমকাম্য বা মোক্ষ। তাই শাস্ত্রবাক্য হল 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্'।

ধর্ম ঃ 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ধৃ + মন্ = ধর্ম। যা ধারণ করে তাই ধর্ম। বেদ উপনিষদে 'ধর্ম'কে এক অলঙ্ঘনীয় নিয়মরূপে গণ্য করা হয়েছে, যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিচালিত হয় এবং জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। ঋগ্বেদে 'ঋত'-কে 'ধর্ম' বলা হয়েছে। ঋত জীবজগৎ ও জড়জগৎকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। জগতের প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব নিয়মে, তার স্বভাব-নিয়মে চলে এবং সেটাই তার ধর্ম। আগুনের স্বভাব উত্তাপ বিকিরণ করা এবং সেটাই তার ধর্ম।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে এবং নীতিশাস্ত্রে সমাজজীবনের প্রেক্ষিতে 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে, লৌকিক অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়নি। লৌকিক অর্থে 'ধর্ম' বলতে বোঝায় 'ঈশ্বর-আরাধনা'। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে **'ধর্ম' শব্দটির অর্থ হল—শাস্ত্রসম্মত সামাজিক আচরণবিধি যা প্রত্যেক মানুষের তার 'বর্ণ' ও 'আশ্রম' অনুসারে অনুসরণীয়।** সমাজে বসবাস করে নিজের এবং অপরের কল্যাণের জন্য মানুষকে যেসব আচরণবিধি অনুসরণ করতে হয়, সেটাই তার ধর্ম। **ব্যক্তি তথা সমাজ তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য কর্মসাধনই মানুষের ধর্ম। সৎকর্মই ধর্ম।** প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় ধ্যান-ধারণা অনুসারে ধর্ম ও নীতি বিশ্লিষ্টভাবে নেই, তা কখনো হয়েছে **ধর্মভিত্তিক নীতি**, আবার কখনো হয়েছে **নীতিভিত্তিক ধর্ম**। মাণ্ডুক উপনিষদ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে, পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণে দশ রকম ধর্মের অর্থাৎ নৈতিক কর্মের উল্লেখ আছে। যথা—(১) অহিংসা, (২) ক্ষমা, (৩) ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা শম এবং দম, (৪) দয়া, (৫) শৌচ, (৬) দান, (৭) সত্য, (৮) তপস, (৯) অস্তেয় ও (১০) জ্ঞান। এসব ধর্মের মধ্যে আবার **অহিংসাকেই 'পরমধর্ম' বলা হয়েছে।** অহিংসা সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম—ক্ষমা, দয়া, শৌচ, সত্য প্রভৃতি অহিংসার অন্তর্ভুক্ত। জৈন ও বৌদ্ধ মতে, অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বুদ্ধ মতে যিনি কর্মে, বাক্যে ও চিন্তায় অর্থাৎ জীবনের সব ক্ষেত্রেই অহিংস তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। এপ্রকার সৎচিন্তা ও সৎপথে জীবন-যাপন প্রত্যেক মানুষের কাম্য বিষয় বা পুরুষার্থ। তবে, **"অর্থ' ও 'কামের' মতো 'ধর্ম'ও পরতঃমূল্যবান পুরুষার্থ—স্বতঃমূল্যবান পরম পুরুষার্থ** 'মোক্ষ লাভের আবশ্যিক উপায় হিসাবেই 'ধর্ম' প্রয়োজনীয়।"[১]

(৪) মোক্ষ ঃ ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে 'প্রেয়' ও 'শ্রেয়'-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। 'প্রেয়' হল, পশু, পুত্র, পরিবার প্রভৃতি সুখদায়ক প্রিয়তর বস্তু ; আর 'শ্রেয়' হল, নিশ্রেয়স বা আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি। যাঁরা প্রেয়মার্গ অনুসরণ করেন অর্থাৎ যাঁরা প্রেয়কে শ্রেয় অপেক্ষা বেশি কাম্য বলেন তাঁরা ত্রিবর্গ পুরুষার্থের—অর্থ, কাম ও ধর্ম—এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থের উল্লেখ করে 'ধর্ম'কেই 'পরমপুরুষার্থ'রূপে গণ্য করেন। এঁদের মতে, অর্থ ও কাম পরতঃমূল্যবান গৌণ পুরুষার্থ, ধর্মাচরণের উপায়রূপে পুরুষার্থ। 'ধর্ম'-ই কেবল মুখ্য পুরুষার্থ।

১. 'Artha, Kama and Dharma are instrumental values, but at the same time essential methods for the attainment of Moksha.' Ethical Philosophies of India. I. C. Sharma. George Allen & Uniwin LTD. London, p. 93.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

প্রাচীন মীমাংসকগণ বেদসম্মত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানকেই 'ধর্ম' বলেছেন। বেদবিহিত যাগযজ্ঞের দ্বারা স্বর্গসুখ লাভ করা যায় এবং স্বর্গসুখই মানুষের পরমকাম্য বা পরমপুরুষার্থ।

কিন্তু যাঁরা শ্রেয়কে প্রেয় অপেক্ষা বেশি কাম্য বলেন তাঁরা ত্রিবর্গের পরিবর্তে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের—অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষ এই চার রকম পুরুষার্থের—উল্লেখ করে 'মোক্ষ'কেই পরমপুরুষার্থ বলেন। এঁদের মতে, সকাম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গসুখ প্রাপ্তি পরম-পুরুষার্থ নয়। **যাকে লাভ করলে আর কিছুই কামনা করার থাকে না, সব প্রয়োজনের অবসান ঘটে, তাই হল পরমপুরুষার্থ।** স্বর্গসুখ এমন নয়, কেননা তা অনিত্য। সকাম কর্মের, স্বর্গসুখ লাভের আশায় যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের, ফলমাত্রই অনিত্য। যে সুখ অনিত্য, যা মানুষকে অমৃতত্ব দিতে পারে না, অমরত্ব দিতে পারে না,—মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা হল, 'এমন সুখ নিয়ে আমি কি করবো'?

মোক্ষবাদীরা তাই ত্রিবর্গ পুরুষার্থের পরিবর্তে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের উল্লেখ করে 'মোক্ষলাভ'কেই পরমপুরুষার্থ বলেন, কেননা মোক্ষলাভের পর পুরুষের অর্থাৎ আত্মার আর কিছুই কামনার থাকে না। তবে, মোক্ষবাদীরা মোক্ষকে পরমপুরুষার্থরূপে গণ্য করলেও মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁরা অভিন্ন মত পোষণ করেন না। বৌদ্ধমতে মোক্ষ বা নির্বাণ হল আত্যন্তিক দুঃখমুক্তির অবস্থা, যা অবাঙমানসগোচর অর্থাৎ যাকে লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মোক্ষ বা নির্বাণ এক তুরীয় অবস্থা এবং লৌকিক ভাষায় তুরীয় অবস্থা অবর্ণনীয়। জৈনমতে, মোক্ষ বা মুক্তি লাভে আত্মা অনন্তজ্ঞান, অনন্তদৃষ্টি, অনন্ত আনন্দ ও পূর্ণতার অধিকারী হয়। শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তমতে, মোক্ষলাভে ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, আত্মা নিজেকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করে। ব্রহ্ম হল সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। কাজেই ব্রহ্মোপলব্ধি বা মোক্ষ হচ্ছে এক অনাবিল আনন্দময় অবস্থা। সাংখ্যযোগ মতে, শুদ্ধ চৈতন্যই আত্মা বা পুরুষ এবং সেজন্য পুরুষের বা আত্মার চিৎস্বরূপে অবস্থানই হল মোক্ষ। ন্যায় বৈশেষিকমতে আত্মা স্বরূপত অচেতন ও নির্গুণ ; কাজেই আত্মার স্বরূপে অচেতন অবস্থায়—সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় —অবস্থানই হল মোক্ষ বা মুক্তি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে, ঈশ্বরের অংশরূপে জীবের যে উপলব্ধি তাই হল মুক্তি বা মোক্ষ। রামানুজ আবার পাঁচ প্রকার মোক্ষ বা মুক্তির উল্লেখ করেছেন। যথা—

(১) **সালোক্য** ঃ ঈশ্বরের সঙ্গে একই লোকে বা ধামে অবস্থান করা।
(২) **সামীপ্য** ঃ ঈশ্বরের সমীপে অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান করা।
(৩) **সারূপ্য** ঃ ঈশ্বরের যে রূপ ধ্যান করা হয় সেই রূপ লাভ করা।
(৪) **সার্ষ্টি** ঃ ঈশ্বরের মতো অনন্ত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা লাভ করা।
(৫) **সাযুয্য** ঃ ঈশ্বরের স্বরূপে যুক্ত হওয়া।

মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে সকলে অভিন্ন মত পোষণ না করলেও একথা সবাই মানেন যে, **সংসারচক্রের আবর্তনকে নিরোধ করাই হচ্ছে মোক্ষ বা মুক্তি**—জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের ঘটনা-প্রবাহ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি। মোক্ষ প্রাপ্তি হলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না এবং জন্মজনিত দুঃখ-ভোগও করতে হয় না।

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

মোক্ষলাভ জীবন থাকতে হতে পারে আবার জীবনাবসানেও হতে পারে। **জীবদ্দশায় মোক্ষলাভ হল 'জীবন্মুক্তি', দেহাবসানে মোক্ষলাভ 'বিদেহমুক্তি'**। জৈন, বৌদ্ধ ও সাংখ্য-যোগ মতে জীবদ্দশাতেই মোক্ষলাভ সম্ভব, যদিও বিদেহমুক্তিই যথার্থ অর্থে মুক্তি বা মোক্ষ। ন্যায়-বৈশেষিক জীবন্মুক্তি মানেন না, কেবল বিদেহমুক্তিই স্বীকার করেন। নব্যমীমাংসকগণও বিদেহমুক্তিকেই যথার্থ মুক্তি বলেন। অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্কর বিদেহমুক্তির সঙ্গে জীবন্মুক্তিকেও সম্ভব বলেন। শঙ্করের মতে, জীবই ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার পরমাত্মারূপে উপলব্ধিই হল মোক্ষ বা মুক্তি। 'অয়ম্ ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম, 'সোঽয়ম্'—আমিই সেই (ব্রহ্ম),—এই প্রকারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞানই মুক্তি। আসলে, আত্মার বন্ধন নেই, মুক্তিও নেই। মুক্তি ও বন্ধন ভ্রমমাত্র। অবিদ্যা বা সত্যজ্ঞানের অভাব (অজ্ঞান) থেকেই বন্ধনভ্রম হয়। অবিদ্যার বিনাশ হলে মুক্তি উপলব্ধ হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। রামানুজের মতে, বর্তমান দেহ বিনষ্ট না হলে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা।

৪.৬. ঋণ (Ṛṇa)

ঋণ একটি বৈদিক প্রত্যয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত প্রত্যয়। 'ঋণ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল, 'কর্জ' বা 'ধার' বা 'দেনা' বা 'দায়'। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে

১. 'Here sociality as well as subjective morality must be merged in the end thereby either to be annulled and transcended or to reappear in a new light and charged with absolute significance. Ibid. P. 5.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

কোন মানুষই অপরের ওপর নির্ভর না করে একাকী জীবন যাপন করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ সমাজস্থ অপর মানুষের দ্বারা, অতীত ও বর্তমান মানুষের দ্বারা, এমনকি মনুষ্যেতর জীব ও নিশ্চেতন জড় পদার্থের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়। এদের প্রত্যেকের কাছে মানুষ তাই নানাভাবে ঋণী এবং সেজন্য মানুষের উচিত দাতার ঋণ যথাসাধ্যভাবে পরিশোধ করা। ঋণ পরিশোধ করতে মানুষ সামাজিকভাবে এবং নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ।

ঋণ পরিশোধ প্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্যে **পঞ্চ মহাযজ্ঞের** উল্লেখ করা হয়েছে। যথা— (১) ঋষিযজ্ঞ (২) পিতৃযজ্ঞ (৩) দেব-যজ্ঞ (৪) নৃ-যজ্ঞ এবং (৫) ভূতযজ্ঞ। এইসব ঋণ পরিশোধমূলক যজ্ঞের মাধ্যমে মানুষ, দাতাকে কিছু উৎসর্গ করে, প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে কিছু অর্পণ বা নিবেদন করে। পঞ্চযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা গেল—

(১) ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ (Ṛśi-yajna or Brahma-yajna) :

প্রাচীন কালের সত্যদর্শী বা ব্রহ্মদর্শী মুনি-ঋষিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা অনেক কিছু লাভ করেছি — তাদের উন্নত ধ্যান-ধারণা, উন্নতজ্ঞান, উন্নত জীবন-বোধ ইত্যাদি। সত্যদর্শী বৈদিক মুনি ঋষিরা বিভিন্ন শাস্ত্রের মাধ্যমে — ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের সেইসব ধ্যান ধারণা, উত্তরাধিকারদের বিতরণের জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সেইসব শাস্ত্র পাঠ করে আমরা নানাভাবে উপকৃত হই, ভারতীয় ভাবধারাকে বহন করার মতো উপযুক্ত হই। কাজেই বৈদিক মুনি-ঋষিদের কাছে আমাদের ঋণ অশেষ এবং সেই ঋণ পরিশোধের জন্যও আমরা দায়বদ্ধ। শাস্ত্রসম্মত ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করলেই ঋণশোধ হয় না, উত্তরাধিকারদের মধ্যে তা বিতরণ করারও প্রয়োজন হয়। বৈদিক ধ্যান-ধারণাকে প্রবাহিত রাখার জন্য সমাজস্থ মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে আমাদের উত্তর পুরুষ অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির মধ্যে, প্রচারের দায়-দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হয়। এই দায় পালন অর্থাৎ প্রচারই হল, মুনি ঋষিদের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে কিছু উৎসর্গ অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ।

(২) পিতৃ-যজ্ঞ (Pitṛ-Yajna) :

পিতৃ-পুরুষের (পিতা, মাতা, প্র-পিতা, প্র-মাতা ইত্যাদির) কাছে মানুষ মাত্রই নানাভাবে ঋণী। আমাদের দৈহিক ও আত্মিক গঠনের মূলে হল, পিতামাতার অবদান—লালন-পালন, পরিচর্যা ও শিক্ষাদীক্ষা— পিতা-মাতার অর্থাৎ পিতৃপুরুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা। শৈশবকালে পিতৃপুরুষের পরিচর্যা না থাকলে কোন মানুষের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। আমরা প্রত্যেকে তাই পিতৃপুরুষের কাছে অশেষ ঋণী এবং কিছু উৎসর্গের মাধ্যমে, দানের মাধ্যমে, সেই ঋণ পরিশোধ করতে আমরা প্রত্যেকে দায়বদ্ধ। পিতৃযজ্ঞে এই উৎসর্গ নানাভাবে পালিত হতে পারে। যেমন, বিশেষ তিথিতে বা উপলক্ষে পিতৃ-পুরুষদের স্মরণ করে জলদান (তর্পণ)। প্রাচীন ভারতীয় ধারণা অনুসারে, বিশেষ তিথিতে সশ্রদ্ধচিত্তে মৃত পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করে জলদান করলে তাঁদের আত্মা তৃপ্ত হয়। কাজেই, যেসব পিতৃপুরুষের কাছে মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক গঠন ও সামর্থ্যের জন্য ঋণী, সেই ঋণ পরিশোধের মানসে বিশেষ তিথিতে তাঁদের স্মরণ করে জলদান মানুষ মাত্রেরই করণীয়। এ-হল এক ধরনের পিতৃযজ্ঞ। অনেক সময় আবার ধর্মীয় বিধি যুক্ত করে পিতৃযজ্ঞকে প্রসারিত করা হয়— বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যথা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ('শ্রাদ্ধ' শব্দের অর্থ 'শ্রদ্ধা

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

সহ') মৃত পূর্বপুরুষকে স্মরণ করে তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দরিদ্রদের, বিশেষ করে দরিদ্র ব্রাহ্মণদের এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের, ঋণমুক্তির জন্য, উৎসর্গস্বরূপ (দক্ষিণাস্বরূপ) খাদ্য, অর্থ ও বস্ত্র দান করা হয়। এই প্রকার পিতৃযজ্ঞের দুটি দিকের উল্লেখ করা যায়— নৈতিক এবং অর্থনৈতিক। দরিদ্রকে অর্থদান করে সাহায্য করা যেমন নৈতিক তেমনি ঐ দানে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক দিকে কিছুটা সাহায্যও করা হয়। কাজেই এপ্রকার পিতৃযজ্ঞে পিতৃঋণ পরিশোধের সঙ্গে সামাজিক ঋণ পরিশোধের দিকটিও পরিস্ফুট হয়। মানুষ মাত্রই তার সমাজের কাছে ঋণী। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতিসাধন করে সেই ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক মানুষেরই করণীয় কর্ম।

(৩) দেবযজ্ঞ (Deva-Yajna) :

বৈদিক যুগে নিসর্গ দেবতার (Nature-gods) ধারণাটির উন্মেষ হয়— নিশ্চেতন বস্তু ও ঘটনার অন্তরালে চেতন ও বুদ্ধিময় সত্তা আছে, এমন ধারণার উন্মেষ হয়। যেমন— বর্ষণ-দেবতা বা জল-দেবতা, অগ্নি-দেবতা, বায়ু-দেবতা, আলোক দেবতা বা সূর্য দেবতা ইত্যাদি। এইসব নিসর্গ দেবতা নৈসর্গিক বস্তু ও ঘটনার মাধ্যমে মানুষকে নানাভাবে উপকৃত করেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আলোক ইত্যাদি না থাকলে মানুষের জীবনধারণ সম্ভব হতে পারে না। এইসব উপকারী দেবতার কাছে মানুষ অশেষ ঋণে আবদ্ধ। এই ঋণ পরিশোধের জন্যই দেবযজ্ঞের প্রয়োজন। দেবযজ্ঞে মানুষ নৈসর্গিক কোন বস্তু বা ঘটনাকে কিছু উৎসর্গ ক'রে সেই ঋণ পরিশোধের প্রয়াস করে। যেমন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে অগ্নিদেবতার ঋণ পরিশোধ করে, জল-প্রবাহে (নদীতে) ফলদান ক'রে জল-দেবতার ঋণ পরিশোধ করে। অনেক সময় মানুষ আবার কতকগুলি বৃক্ষ-গুল্ম অথবা পাহাড়-পর্বতকে কিছু উৎসর্গ ক'রে তাদের অন্তরালবর্তী দেবতার প্রতি তাদের ঋণ পরিশোধ করে। কাজেই বৃক্ষ পূজা, শিলা পূজা ইত্যাদিও দেবযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার দেবযজ্ঞে পরিবেশ সম্পর্কে তৎকালীন মানুষের সচেতনতা পরিস্ফুট হয়— বৃক্ষ-পর্বতাদির পরিচর্যা করে মানুষ পরিবেশকে কিছুটা মলিনতামুক্ত করে, দূষণমুক্ত করে।

(৪) নৃ-যজ্ঞ (Nṛ-Yajna) :

মানুষ কেবল বিশেষ কোন মানুষের কাছে, পরিচিত কোন মানুষের কাছে, তার প্রতিবেশী মানুষের কাছে অথবা তার সমাজের সমস্ত মানুষের কাছে ঋণী নয়, সে মানবজাতির কাছেও বিশেষভাবে ঋণী। মানুষ যে ভাষা ব্যবহার ক'রে তার ভাব প্রকাশ করে তা তার পরিচিত বিশেষ একটি বা কয়েকটি মানুষের অবদান নয়, তা হল মানবজাতির অবদান। মানুষ যে গৃহরচনা ক'রে বসবাস করে তা বিশেষ কোন সমাজস্থ মানুষের আবিষ্কার নয়, তা হল মানবজাতির আবিষ্কার। মানুষ তাই মানবজাতির কাছে নানাভাবে ঋণী। এজন্য, নির্বিশেষে ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্নদান ক'রে, বস্ত্রহীন মানুষকে বস্ত্রদান ক'রে, গৃহহীন মানুষকে আশ্রয়দান করে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে, মানবের প্রতি মানুষের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এই প্রকারে ঋণশোধই হল নৃযজ্ঞ। নৃযজ্ঞের মাধ্যমে সমাজ সুসংগঠিত হয় এবং সমাজের উন্নতিও ত্বরান্বিত হয়।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(৫) ভূতযজ্ঞ (Bhuta Yajna) :

'ভূতযজ্ঞ' বলতে বোঝায়, আমাদের চারিপাশের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত রকম জীব ও উদ্ভিদের পরিচর্যাপূর্বক ঋণশোধ প্রক্রিয়া। জগতে মানুষের অবস্থান অতি নগণ্য, সমগ্র দেহে একটি কোষতুল্য। মানুষের চারিপাশ ঘিরে আছে বিশাল এক প্রাণের জগৎ — জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ। এদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের ওপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। মানুষ প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন কোন জীব নয় — প্রকৃতির পরিবেশের অন্তর্গত জীব ও অজীবের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা হল নির্ভরতার সম্পর্ক, যাকে আজকের বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় ecology বা বাস্তু-সংস্থান। এদের কোন একটির ক্ষতিসাধন করা হলে বাস্তুসংস্থান বিঘ্নিত হয় এবং তার ফলে মানুষের অস্তিত্বও হয় বিপন্ন। মানুষ তাই এদের প্রত্যেকের কাছে অশেষভাবে ঋণী এবং তাদের রক্ষাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করে ঋণশোধ প্রচেষ্টাই হল ভূতযজ্ঞ। মানুষ যেমন তার নিজের জীবনরক্ষার জন্য যত্নবান হয়, তেমনি একটি অতিক্ষুদ্র পিপীলিকার জীবনরক্ষার জন্যও তার যত্নবান হওয়া প্রয়োজনীয়, কেননা পিপীলিকা প্রজাতিটি বিনষ্ট হলে ecology বিনষ্ট হয় এবং তার ফলে মানুষের অস্তিত্বও হয়ে ওঠে বিপন্ন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুখসন্ধান করতে গেলে সাধারণের সুখকে অবহেলা করা যায় না। ভারতীয় ধ্যান-ধারণা অনুসারে, সজীব প্রাণী মাত্রই আত্মাবান। পিপীলিকার আত্মা বিনষ্ট হলে মানুষের আত্মারও অনিষ্ট হয়। মানুষের অস্তিত্ব তাই প্রতিটি জীবের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরতার জন্য মানুষ তাদের প্রত্যেকের কাছে কোন না কোনভাবে ঋণী। এই ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয়। ভূতযজ্ঞ যদিও মুখ্যত মনুষ্যেতর জীবের কাছে মানুষের ঋণশোধমূলক কর্ম, তথাপি এজাতীয় ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষিত হয়।

৪.৭. ঋত (Ṛta)

বৈদিকযুগে এক অলঙ্ঘনীয় শক্তির প্রতি— কখনো জড়শক্তিরপ্রতি আবার কখনো জড় এবং চেতন নৈতিকশক্তির প্রতি—বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে। ঋক্ সংহিতায় (সংহিতা = মন্ত্রসম্ভার) এই শক্তিকেই 'ঋত' বলা হয়েছে। বৈদিক যুগের দেবতাদের এই শক্তির ধারক বা আশ্রয়রূপে গণ্য করে বলা হয়েছে 'গোপা ঋতস্য' — দেবতারা হলেন ঋতের ধারক বা অভিভাবক, 'ঋতায়ু'— দেবতারা ঋত শক্তিকে ব্যবহারপূর্বক বিশ্বজগৎ পরিচালনা করেন। ঋত-এর জন্যই জগৎবৈচিত্র্যের মধ্যে আছে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, একরূপতা। দিনের পর যে রাত এবং রাতের পর দিন ক্রমান্বয়ে ঘটে চলেছে তার মূলে হল দেবতার ঋতশক্তি।

ঋত-এর ধারণার উৎপত্তিলগ্নে ঋতকে কেবল জড়শক্তিরূপে (যা জড়জগৎকে পরিচালিত করে) গণ্য করা হলেও সংহিতার (মন্ত্রের) ব্যাখ্যায়, পরবর্তীকালে, ঋতকে নৈতিকশক্তিরূপেও গণ্য করা হয়। অর্থাৎ ঋত-এর ধারক দেবতাদের কেবলমাত্র জড়জগতের পরিচালকরূপে গণ্য না করে অতিরিক্তভাবে মানুষের নৈতিকজগতের পরিচলকরূপেও গণ্য করা হয়— দেবতারা কেবল মহাজাগতিক শৃঙ্খলাকেই রক্ষা করেন না, অতিরিক্তভাবে, নৈতিক জগৎকেও নিয়মাধীন করেন। দেবতারা সৎব্যক্তির প্রতি সদয় হন এবং অসৎব্যক্তির প্রতি নির্দয় হন। কাজেই, দেবতাদের বিরাগভাজন না হবার জন্য এবং তাদের প্রসন্ন করার জন্য উচিত সৎপথে অগ্রসর হওয়া।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ঋত-এর ধারক ও বাহকরূপে দেবতাদের এই দুই প্রকার দায়-দায়িত্বের কথা — জড়জগতের এবং নৈতিকজগতের শৃঙ্খলারক্ষকের কথা — বৈদিক দেবতা **অদিতি** এবং বিশেষ করে **বরুণের** প্রত্যয়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। **অদিতি হল সীমাহীন সব**—আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, পিতা, মাতা, সন্তান — যা ছিল, যা আছে এবং যা হবে সবই। ঋত-এর অভিভাবকরূপে অদিতি জড় এবং চেতন জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। সূর্য যে আকাশপরিক্রমণ করে, নদী যে সমুদ্রের অভিমুখী হয়, এসবই অদিতির ঋতশক্তির জন্য।

বৈদিক দেবতা **বরুণের** প্রত্যয়টিতে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জড়জগতের নিয়ম-ব্যবস্থাকে বরুণদেবতাই নিয়ন্ত্রিত করেন, যে নিয়ম-ব্যবস্থাকে অমান্য করা কোনভাবেই সম্ভব নয়, অর্থাৎ যা অলঙ্ঘনীয়। যেমন, বরুণের ঋতশক্তির জন্যই নদী তার তটভূমিকে প্লাবিত না করে জলপ্রবাহকে সমুদ্রাভিমুখী করে। বরুণের এই নিয়ন্ত্রণশক্তি (অর্থাৎ ঋত) কেবল জড়জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়— মানুষের নৈতিকজগৎকেও তিনি একইভাবে নিয়মাধীন করেন, যে নিয়ম অমোঘ ও অলঙ্ঘ্য। মানুষের সামান্যতম এবং গোপন পাপও সর্বজ্ঞ ও সবদর্শী বরুণের অজ্ঞাত থাকে না। আকাশের সূর্য যেন বরুণের চোখ—সূর্যালোকে যেমন সবকিছু আলোকিত ও পরিস্ফুট হয়, বরুণের নজরেও তেমনি জগতের সব ঘটনা ও মানুষের কর্মাদি পরিস্ফুট হয়।

বরুণের প্রত্যয়টি পরবর্তীকালে **ইন্দ্রদেবতার** প্রত্যয় দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন হয়, কেননা ইন্দ্রকে মূলত শৌর্য বীর্যের দেবতা বা যুদ্ধ-দেবতা রূপে গণ্য করা হয়, যেখানে দেবতার ধর্মনিষ্ঠার দিকটি কিছুটা অবহেলিত হয়। দেব-মহিমা এভাবে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, ঐ সময়ে, অর্থাৎ ইন্দ্রদেবতার ধারণাটির উন্মেষকালে, বৈদিক যুগের ভারতবাসীদের নৈতিক জীবন কিছুটা অধোগামী হয়। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় পটভূমি বিচার করে হিরিয়ন্ন অভিমতটিকে অসত্য বলেছেন।* বহিরাগত আর্যরা ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে প্রবল বিরোধী শক্তির সম্মুখীন হয়— ভারতে বসবাসকারী অনার্যদের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত থেকে তাদের পরাভূত করতে হয়। এজন্য ঐ সময়ে শান্তিরক্ষক দেবতার (অর্থাৎ বরুণের) পরিবর্তে শৌর্য বীর্যের দেবতাকে— শত্রুনিধনের দেবতাকে আহ্বান করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এজন্যই সেই বিশেষ পটভূমিকায় যুদ্ধ বিজয়-দেবতা ইন্দ্রের প্রত্যয়টির উন্মেষ হয়।

তবে, সেই জরুরী অবস্থায় ইন্দ্রের ধারণাটি উন্মেষ হওয়ার পর, শত্রু নিধনের জন্য তৎকালীন ভারতবাসী আর্যদের মধ্যে হিংস্রতা, প্রচণ্ডতা, রক্তলোলুপতা ইত্যাদি অনৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দিলেও তা ছিল সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী নয়। অনার্যদের পরাস্ত ও বশীভূত করার পর ইন্দ্রের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে অন্য কোন দেবতাকে সর্বোত্তমরূপে গণ্য করা হয়, যিনি যুগপৎ জড়জগৎ এবং নৈতিকজগতের ধারক ও বাহক, যিনি কেবল বীর্যবান নন, নীতিনিষ্ঠও। এইসময় যেমন ইন্দ্রের শৌর্য বীর্যের সঙ্গে নৈতিকগুণাবলী যুক্ত করা হয়, তেমনি আবার বরুণের মহিমাও কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে বলা হয়— আকাশের দেবতা বরুণই একমাত্র ঋত-এর ধারক ও নিয়ন্ত্রক নয়, অপরাপর দেবতারাও একইভাবে ঋত-এর ধারক ও নিয়ন্ত্রক।

---

* Outlines of Indian Philosophy — M. Hiriyanna. P 34

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

বৈদিক যুগে বহুদেবতার ধারণা— তেত্রিশটি দেবতার ধারণা পোষণ করে তাদের তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। যথা— (১) ঊর্ধ্বাকাশ-দেবতা— মিত্র এবং বরুণ, (২) মধ্য-আকাশ দেবতা — ইন্দ্র এবং মরুৎ এবং (৩) পৃথিবী দেবতা—অগ্নি এবং সোম। প্রত্যেক দেবতা তাদের ঋতশক্তির দ্বারা নিজ নিজ ক্ষেত্রকে নিয়মসম্মতভাবে পরিচালিত করেন, যে নিয়ম প্রতিক্ষেত্রে অমোঘ ও অলঙ্ঘ্য।

ঋক্‌বেদে যে অলঙ্ঘনীয় দেবশক্তিকে ঋত বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় তাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লেখ করেছেন। মীমাংসা দর্শনে একেই বলা হয়েছে, **'অপূর্ব'**, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে **'অদৃষ্ট'** এবং সাধারণভাবে সব দর্শনেই (চার্বাক ব্যতীত) বলা হয়েছে **'কর্মনীতি'** (Law of Karma).

ঋত-এর রূপান্তর **কর্ম-নিয়ম**ও (Law of Karma) ঋত-এর অনুশাসনের মতো অমোঘ ও অলঙ্ঘ্য। কর্মনিয়মে একথাই বলা হয় যে, জড়জগতের নিয়ম-ব্যবস্থার মতো মানুষের জগতের, নৈতিক জগতের নিয়ম-ব্যবস্থাও অব্যতিক্রমী, এবং তা কর্ম-নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় ন্যায়সম্মত এবং ধর্মসম্মত। মানুষের কোন্ কর্ম ভাল এবং কোন্ কর্ম মন্দ তা কর্ম-নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং ন্যায়-বিচারকরূপে দেবতা বা ঈশ্বর মানুষকে তার ভাল/মন্দ কর্ম অনুসারে ফলদান করেন।

ঋত-এর রূপান্তররূপে কর্ম-নিয়ম আসলে একপ্রকার নৈতিক কার্যকারণ নিয়ম। বাহ্য জগতের কার্য-কারণ নিয়মকে নৈতিকজগতে প্রয়োগ করেই তাকে 'কর্মনীতি' বা 'কর্মনিয়ম' বলা হয়েছে। কর্মবাদের (কর্ম নিয়ম সংক্রান্ত মতবাদের) সার কথা হল— জীবনে সুখ-দুঃখ ভোগ কৃতকর্মেরই ফল। কৃতকর্ম হচ্ছে কারণ, আর সুখ-দুঃখভোগ কার্যফল। কর্ম করলে তদনুসারে ফল পেতেই হবে, ভাল কাজের ভাল ফল, মন্দকর্মের মন্দ ফল— এজীবনে না হলেও অন্য কোন পরবর্তী জীবনে। কর্মফল ভোগের জন্যই মানুষ জন্মগ্রহণ করে, পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগের জন্য বর্তমান জন্ম, আবার বর্তমান জীবনের কর্মফল ভোগের জন্য পরবর্তী জন্ম। তবে, নিষ্কামভাবে কর্ম করলে ফলভোগ করতে হয় না। নিষ্কাম কর্ম **সঞ্চিত** কর্মফলকে বিনষ্ট করে এবং **সঞ্চয়মান** কর্মফলকে রোধ ক'রে জন্ম-জন্মান্তর-চক্রকে রুদ্ধ করে এবং সেভাবে দুঃখমুক্তির পথকে সুগম করে। এভাবে, কর্ম-নিয়মকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ভারতীয় দর্শনে জন্মান্তরবাদকেও স্বীকার করা হয়। কর্ম-নিয়ম নিঃশর্ত নয়, শর্তাধীন — কেবল সকামকর্মের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম অলঙ্ঘ্য, নিষ্কাম কর্মের ক্ষেত্রে নিয়মটি প্রযোজ্য নয়।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner